হুমায়ুন ফরিদি ও অন্যান্য বিষাদগাথাঃ সপ্তর্ষি বিশ্বাস

হুমায়ুন ফরিদি ও অন্যান্য

বিষাদগাথা

সপ্তর্ষি বিশ্বাস

প্রথম প্রকাশ

২৫শে এপ্রিল ২০১২

© মধুশ্রী বিশ্বাস

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সপ্তর্ষি বিশ্বাস

প্রকাশক
অভিমান
গৌতম চৌধুরী
২৬/৩১/২ কৈপুকুর লেন
হাওড়া ৭১১ ১০২
পশ্চিমবঙ্গ ভারত

মূল্য
****

HUMAUN FARIDI O ONYANYO BISHAD-GATHA
a collection of prose
by saptarshi biswas (b.1972)
published by gautam chaudhury

উৎসর্গ

আমার গদ্য রচনার প্রথম উৎসাহী পাঠক, সমালোচক ও প্রকাশক
সুজিৎ চৌধুরি, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, ইন্দ্রনীল দে, শেখর ভট্টাচার্য, কিশোর ভট্টাচার্য, অমিতাভ দেব চৌধুরি ও গৌতম চক্রবর্তী কে ...

<u>পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থ</u>

পাপের তটিনী ধরে

যুগলবন্দী

সূচি

৯ সেইসব ‘নাটকেরা’

১৩ ‘মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব...’

১৯ ‘হঠাৎ কখন অজানা সে’

২৯ ‘সবচেয়ে বেশি রূপ ...সব চেয়ে গাঢ় বিষণ্নতা’

৩৩ চার্চরোড কথা

৩৭ নিদাঘ- কাহিনী

৪১ আর কে জৈন ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং আমরা...

৪৭ ‘নাইয়ারে নাওএর বাদাম তুইল্লা’

সেইসব ‘নাটকেরা’

টেলিভিশন তখন অনেকের বাড়িতেই এসে গেছে। কিন্তু সমস্যা দ্রষ্টব্য নিয়ে। আসামের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে দিল্লীর অনুষ্ঠানগুলিকে এন্টিনাবন্দি করা যেত না তখন। বরং যেহেতু নদী পার হলেই বাংলাদেশ, তাই বাংলাদেশের জাতীয় অনুষ্ঠানগুলি ধরা দিত সহজেই। ছবির কোয়ালিটিও ছিল ঝকঝকে। ফলে টেলিভিশনে একমাত্র দ্রষ্টব্য ছিল ঐ বাংলাদেশ টেলিভিশনই। প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমল ছিল সেটা। প্রোগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে, সংবাদের সিংহভাগ সময় জুড়ে এরশাদের বাণী ও চেহারা প্রচারিত হতে বলে, একে বলা হ’ত ‘এরশাদ- দর্শন’ও ...

আমাদের পাড়ায় টেলিভিশনওয়ালা চার পাঁচটি বাড়ির মধ্যে যেগুলোতে আমাদের যাতায়াত ছিল, তাদের মধ্যে ছিল মিত্রাদিদের বাড়ি আর জ্ঞানশর্মা জেঠুদের বাড়ি ... আমরা শুধু নয়, আরো অনেকেই গিয়ে জুটত ঐসব টিভিওয়ালা বাড়িতে। এতে গর্বে গৃহকর্তা- গৃহকর্ত্রীর বুক যে কিছুটা ফুলে উঠত তা প্রায়ই বেরিয়ে পড়ত তাদের কথা বার্তায় ... ‘ও আপনি অমুকের বাড়িতে যান বুঝি ... আচ্ছা ... ওদের বাড়ির পাশে তো বাঁশঝাড়, সিগন্যাল আসে? ...বা ‘ও, ওদের বাড়ির টিভিটা আরো কি কোম্পানির, আমাদেরটা তো ‘পেনোরামা’ ...’। এহেন বাক্যালাপে টিভিওয়ালাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতাটাও বোঝা যেত স্পষ্ট ...

কিন্তু টিভিতে ঠিক কী দেখার আকর্ষণে গিয়ে হাজির হ’ত সবাই? আবালবৃদ্ধবনিতা? কিসের টানে গিয়ে হাজির হতাম আমি? বয়ঃসন্ধির চৌকাঠে পা রাখা এক সদ্যকিশোর? হাজির হতাম কয়েকটি মুখের টানে, তাদের অভিনয়ের টানে ... হাজির হতাম সেই ভাষার টানে যে-ভাষা ‘কেলু’ বা ‘কইলকাত্তাইয়া শুদ্ধ বাংলা’ নয় ...

যে-ভাষায় মিশে আছেন লালন, হাসন্ রাজা ... মিশে আছে আমার পিতামহ□ প্রপিতামহ□ মাতামহ□ প্রাচীনমাতামহের স্বর, সুর ... যে-ভাষায় চট্টোপাধ্যায় কে চাটুজ্জে, বন্দ্যোপাধ্যায় কে বাড়ুজ্জে বলে ছেঁটে না ফেলে বরং নরেশকে 'নরেশ্যা', অমলকে 'অমইল্যা', আব্দুলকে 'আব্দুইল্লা' বলে দীর্ঘতর স্থায়িত্ব দেয় নামগুলিকে ... নামের আড়ালে থাকা মানুষগুলিকে ... বলে না 'খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কিকরে আসে যায় ...' বলে 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কম্নে আইসে যায় ...' ... ঐ নাটকের মানুষগুলিও কথা বলত ঐ ভাষায় ... শোনাত গল্প আমাদের সেই ফেলে আসা অতীতের ... ভুলে যাওয়া মূল্যবোধের ... আমাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া এক- অন্নবর্তী পরিবারের ... বলত 'আমি কানকাটা রমজান ... আমারে চিইন্যা রাখ ...' ... বলত 'আপনেরা ত বট বিরিক্ষ ... তাই মনে করলাম আপনাদের ছায়ায় আইস্যা পরি ...' ... ঐ বলার আবডালে বয়ে যত গল্পের স্রোত ... মামা, দুলাভাই, কানকাটা রমজান, 'তুই রাজাকার' বলা কাকাতুয়া ... বহুব্রীহি, ঢাকায় থাকি, এই সব দিন রাত্রি, সংশপ্তক, অয়োময় □ আবুল হায়াত, আলী যাকের, আসাদুজ্জামান নুর, হুমায়ুন ফরিদি, বিপাশা হায়াত, সুবর্ণা মুস্তাফা ... ফলে বাংলাদেশকে আমার দেশ মনে হওয়ার যে বাস্তবতা, আমার মর্মে, আরো অনেক বরাকবাসীর মর্মে তা হঠাৎ সকালে উঠে একদিন বাঙ্গালির ছেলের 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' হেঁকে ওঠার মতো ভুঁইফোঁড় কিস্যা- কাহিনি নয় ...

সেই বয়সে কতটা আর মনে নিতে পারতাম সেইসব নাটকের অন্তর্গত ইঙ্গিতগুলি? জানি না। তবে কাহিনির গহনের ভালো মন্দের মোটা বিভেদ রেখাটাকে ছুঁতে পারতাম অবশ্যই। সেই টানেই গিয়ে হাজির হতাম 'টিভিওয়ালা'দের বাড়িতে ... তারপর এল 'দিল্লী' তার প্রচারযন্ত্র নিয়ে। এন্টিনা ঘুরিয়েও আর পাওয়া গেল না 'সেইসব

দিন রাত্রি...' ... 'নাটক'এর স্থান দখল করে নিল সিরিয়াল ... মেগা সিরিয়্যাল ... ক্রমে ... প্রভূত বিত্তশালী পরিবারের আবহে কাহিনিকার আর পরিচালকের স্ব- কপোল- কল্পিত সমস্যাই যেগুলির উপজীব্য ... হ্যাঁ যদিও হিন্দি ভাষায় তথাপি 'মালগুড়ি ডেইস্'হেন কিছু সিরিয়াল'ও দেখিয়েছিল দিল্লী ... ঠিক ... কিন্তু ঐযে, আমি বাঙ্গালি, আমি বাংলাদেশী, 'আমি বাংলায় গানগাই ...আমি বাংলার গান গাই...' তাই ভাষার টান না থাকায় বাংলাদেশ টেলিভিশানের সিগন্যাল আসা বন্ধ হয়ে যাওয়াটা আমার এক অতি নিবিড়, ব্যক্তিগত বিয়োগ ... পরে আবার বাংলা চ্যানেল বলে এক রকমের চ্যানেল যখন মাথা চাড়া দিল, তখন অবস্থা আরো সঙ্গিন! 'বহুব্রীহি' বা 'সংসপ্তক'এর কাছে ঐ সব 'কইলকাত্তাইয়া' সিরিয়েলের কাহিনি যেমন 'জাস্ট অখাদ্য', তেমনি অখাদ্য অভিনয় ... তেমনি অসৎ তাদের প্রযোজনা ... যেখানেই পূর্ববঙ্গীয় চরিত্র, সেখানেই এক আজগুবি ভাষার আমদানি, যে-ভাষা পূর্ববঙ্গে কোনোদিন ছিল না, থাকবেও না ... যে ভাষা 'কফি হাউস ইন্টেলেকচুয়ালদের স্ব কপোল কল্পিত অথবা এন আর আই প্রযোজকের পয়সায় হাভাতে পরিচালকের সুরাপানের মৌতাতে নির্মিত ... ঐভাবে এরা অবমাননা করল শুধু পূর্ববাংলার বা তার ভাষার নয়, অবমাননা করল সমগ্র বাংলা ভাষা- পৃথিবীর ...

কথাগুলি মনে আসে, মনে পড়ে ছবিগুলি, দৃশ্যগুলি, কানে বাজে উচ্চারণগুলি, প্রতি নিয়ত ... কিছু কিছু প্রকৃত ভাষাপ্রেমিক ঐ নাটকগুলিকে যত্নে উঠিয়ে রেখেছেন ইন্টারনেটে, ইউ- টিউবে ... তাই মাঝে মাঝে দেখি, একা একা বসে, রাত্রি জেগে ... ভাবি সেই শৈশবের কথা, অতীতের কথা ... ভাবতে ভাবতে আবারও টের পাই বাংলাদেশকে আমার দেশ মনে হওয়ার যে বাস্তবতা, আমার মর্মে, আরো অনেক বরাকবাসীর মর্মে তা হঠাৎ সকালে উঠে একদিন

বাঙ্গালির ছেলের ‘চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান’ হেঁকে ওঠার মতো ভুঁইফোঁড় কিস্যা- কাহিনি নয় ... সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মলইবাজার এই নামগুলি ছাড়া, ভূগোলগুলি ছাড়া যেমন আরম্ভই হয় না আমার, আমার মতো অনেকের শিকড়সন্ধান, তেমনি বহুব্রীহি , ঢাকায় থাকি, এই সব দিন রাত্রি, সংশপ্তক, অয়োময় আবুল হায়াত, আলী যাকের, আসাদুজ্জামান নুর ,হুমায়ুন ফরিদি, বিপাশা হায়াত, সুবর্ণা মুস্তাফা এই নামগুলি, মুখগুলি ছাড়া পূর্ণ হই না আমি, আমার শৈশব, আমার বর্তমান, আমি, আমার কবিতা ...

... হায় ... সেই সংসপ্তকের সেই হুমায়ুন ফরিদি আজ নেই ! নেই সেই ‘কানকাটা রমজান’ ... হায় আমার শৈশবের দিকে ফিরে যাওয়ার পথের আরেকটি সাঁকো আজ ভেঙ্গে গেল ...

১৪/০২/২০১২

‘মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব...’

১.

পরিষ্কার মনে আছে মঞ্চে কী একটা গান হচ্ছিল আর অডিটোরিয়ামের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি দ্রুত টেনে শেষ করছিলাম সেদিনকার অসংখ্য নম্বর চারমিনারটা। এমন সময় শোনা গেল শ্যামাদার গলা ‘এই দ্যাখ্ তো বাদলদার কী লাগে...’। ফিরে তাকিয়ে দেখি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন বাদল সরকার ... সেই বাদল সরকার ‘পাগলা ঘোড়া’ যাঁর রচনা! যাঁর রচনা ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ ... যাঁর রচনা, বলতে গেলে, পথে পথে নাটক করে বেড়ানোর এই পাগলামিটাই ...

সে হবে ১৯৯২-৯৩ সাল ... যদিও আসামের এক প্রত্যন্ত মফস্বল তথাপিও সেখানেও তখন কমতি ছিল না আমাহেন জিন্স্, পাঞ্জাবি, হাওয়াই চপ্পল আর চারমিনার শোভিত যুবকের, যারা সত্যিই ভাবত ৭০এর দশককে তারা ফিরিয়ে আনবেই ... আর ছিল শ্যামাদা, মন্দিরাদি হেন দাদাদিদিরা, যারা নিজেদের জীবনের সর্বস্ব দিয়ে রসদ জোগাত আমাদের ঐ স্বপ্নে ... তেমনি কিছু দাদা-দিদিদের উৎসাহে হয়েছিল এক সংস্থা, নাম ছিল ‘ঐকতান’ ... যেহেতু দাদাদিদি এবং আমরাও গোগ্রাসে গিলেছিলাম চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ইতিহাস এবং চারুবাবু, ফলে ঐ সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিমুখী : বাইরে থেকে এটা হলো ‘গণফ্রন্ট’ অর্থাৎ ‘কেমোফ্লেজ’, আর অন্দরে সসস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতির কারখানা ...

সেই ‘ঐকতান’এই একবার স্থির হ’ল ‘তৃতীয় ধারা’র নাট্যোৎসব হবে। সঙ্গে আরো কিছু অনুষ্ঠান, সেমিনার ইত্যাদি... সেই

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলেন বাদল সরকার! আমরা, নাটকপাগলেরা দিন গুনতে লাগলাম উৎসাহে!

সে হবে ১৯৯২-৯৩ সাল, তখনও আমাদের ঘরে ঘরে টেলিভিশান হানা দিলেও রেডিও চালিয়ে নানান ষ্টেশান থেকে প্রচারিত নাটক শোনার লোকও ছিল কিছু ... সেভাবেই শোনা 'এবং ইন্দ্রজিৎ' আর 'পাগলা ঘোড়া' ... বাদল সরকারের প্রযোজনার নকলে একদল 'ল্যোকাল নাটুকে'ও মঞ্চস্থ করেছিলেন 'পাগলা ঘোড়া' আর তা 'পাগলা ঘোড়া'র মফস্বলি সংস্করণই হয়েছিল বটে ...

সে হবে ১৯৯২-৯৩ সাল, তখনও ইন্টারনেট নেই, নেই 'গুগুল্', তথাপি জেনেছিলাম বাদল সরকার পেশায় ছিলেন সফল আর্কিটেক্ট, জেনেছিলাম সেই রমরমে জীবিকা ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে নাটকের টানে তিনি নেমেছিলেন রাস্তায় ... ব্যক্তিগতভাবে ঐ সব ছেড়েছুড়ে রাস্তায় নামার ব্যাপারটা তাঁর নাটকের চেয়েও আমাকে বেশি আকর্ষণ করেছিল। আজও করে ...

জানতাম বাদল সরকার আমন্ত্রিত, জানতাম তিনি আসছেন। তথাপি এভাবে, করিমগঞ্জ কলেজের অডিটরিয়ামের পাশের আধো অন্ধকার বারান্দায়, রাত্রি প্রায় দশটায় তাঁর সঙ্গে হবে আমার প্রথম সাক্ষাৎ, তা কি কল্পনাও করেছিলাম কখনও? যদিও 'ফর্ নিউ ডেমোক্রেসি' আর 'অনীক' পড়ে পড়ে চেষ্টা চালাচ্ছিলাম আপাদমস্তক 'ডিক্লাসড্' হওয়ার, তবু কীভাবে যে তাঁকে দেখামাত্র মাথা নুয়ে গেল, হাত চলে গেল তাঁর পায়ের দিকে জানি না! তিনি হাত ধরে নিবৃত্ত করলেন আমাকে। একটু সামলে নিয়ে বললাম 'কখন এলেন?' বললেন 'একটু আগে। বসে বসে অনুষ্ঠান দেখছিলাম ...আচ্ছা এখানে সিগারেট কোথায় পাই বলুন তো?' বাদল সরকার আমাকে

‘আপনি’ বলছেন! আমার দশা মরমে মরে যাওয়ার ... বললাম ‘আমার কাছেই আছে... নিন্ না ...’ মেলে ধরলাম আমার চারমিনারের সম্ভার। একটা তুলে নিয়ে জ্বালিয়ে বললেন ‘চারমিনার আপনাদের বয়সে খেয়েছি দেদার ...এখন পারি না ... একটা দোকান খুঁজে ফিল্টার উইল্স্ পাওয়া যাবে? এখন তো অনেক রাত হয়ে গেছে ...’ আমি বললাম ‘নিশ্চয় যাবে, কেন যাবে না ... আপনি বসুন, আমি এক্ষুনি গিয়ে নিয়ে আসছি ...’ বাদল সরকার বললেন ‘ না না, আমিও আপনার সঙ্গে যাব ... নতুন জায়গায় আমার ঘুরে বেড়াতে খুব ভালো লাগে ...’

তাঁকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে এলাম কলেজ চত্বর ছেড়ে। রাস্তার ও পারেই দু দুটো সিনেমা হল্। শ্রীরাধা আর শ্রীদুর্গা। শ্রীরাধার ভেতরে দোকান দেয় শামুদা। হিট্ ফিল্ম লাগলে চালায় টিকিটের ‘পাঁচ কা দশ’, তবে আমাদের মতো দুয়েকজন ‘প্রকৃত ডিক্লাস্ড্’কে সে ফ্রীতে টিকিট দেয়। দেয় ধারে সিগারেট ...তখন রাত্রি ১১টা পেরিয়ে গেছে। শামুদা’র ঝাঁপ বন্ধ। তবে আমি জানি শামুদা ভেতরে আছে। আরো ঘন্টাখানেক থাকবে। শেষ করবে, একা একা, তার দুই বোতল চোলাই ...তারপর যাবে ...

শামুদাকে ডেকেডুকে জোগাড় হ’ল সিগারেট। নিজের দুই প্যাকেট উইল্স্ ফিল্টারের সঙ্গে আমাকেও উপহার দিলেন এক প্যাকেট চারমিনার। তারপর বললেন : ওদের কাজকম্মো শেষ হতে এখনও বিস্তর দেরি ... একটু হেঁটে আসবেন ?

আসব না মানে? সঙ্গে সঙ্গে বললাম : চলুন ...

২.

মফস্বলের সেই রাত ১১টা মনে পড়ে। মনে পড়ে তাঁর পাশে পাশে হেঁটে যাওয়া। মনে পড়ে আলোহীন মফস্বলের পাঁজরভাঙ্গা রাস্তা। মনে পড়ে সেই উত্তেজনা উদ্দীপনা, বাদল সরকার হেন এক পার্বত্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে যাওয়ার ... যা মনে পড়ে না তা হ'ল ঠিক কী কথা, কী কী কথা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে ... যত দূর মনে হয় তাঁর নাটকগুলি ঘিরে আমার মুগ্ধতার কথাই বলে যাচ্ছিলাম অনর্গল ... বলতে বলতে এও বলেছিলাম যে, 'তাঁর হট্টমালার ওপারে'কে আমার খুব দুর্বল কাজ বলে মনে হয় (আজও মনে হয়) ... সম্ভবত উত্তরে তিনি বলেছিলেন 'এই লেখাটারও একটা পার্পাস্ আছে ... সেটা ভেবে দেখবেন ...'

তারপর অনেক দিন, অনেক রাত চলে গেছে। তেমন করে না ভাবলেও ক্রমে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'হট্টমালার ওপারে'র পার্পাস্ আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে বহুদূর। তথাপি 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'বাসি খবর', 'যদি আরেকবার' ,'বাকি ইতিহাস' বা 'পাগলা ঘোড়া'র পাশাপাশি তাঁর ঐ রচনাটিকে স্থান দিতে পারিনি অদ্যাপি ...

এমনি এলোমেলো কথায় এক চক্কর ঘুরে আমরা ফিরে এলাম কলেজ চত্বরে। পুনরায়।

৩.

অনুষ্ঠানের শেষ দিন তাঁকে বলা হল বক্তব্য রাখতে। বাদল সরকার বললেন : বক্তব্য আর কী রাখব, বরং আমার নাটুকে জীবনের কিছু কিছু অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের বলি আর আপনারাও বলুন আপনাদের অভিজ্ঞতার কথা...'

অভিজ্ঞতার সেই সমস্ত কথাগুলি কে যেন ধরে রেখেছিলেন টেপ্ রেকর্ডারে, পরে সম্ভবত কোথাও ছাপাও হয়েছিল এগুলি। এত বছরের দূরত্বে সে সব আর মনে পড়ে না আজ ... মনে পড়ে শুধু একটি ঘটনার কথাই ... সেটা বোধহয় পুরুলিয়ার দিকে কোথাও ঘটেছিল ... দল নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে নাটক করে বেড়াচ্ছেন বাদল সরকার তখন। এভাবে দুটো গ্রাম পারিয়ে আসার পর তাঁরা লক্ষ্ করলেন এক বুড়ি, প্রায় ভিখারী শ্রেণির, তাঁদের দলের পিছু পিছু যায় আর দর্শকের আসনে বসে দেখে নাটকগুলি ... একই নাটক হয়তো, তবু দেখে, দেখে মুগ্ধ হয়ে, দেখে চোখে জল নিয়ে ... আর সেই দেখার মূল্যে সে পায়ে হেঁটে চলে যায় তাঁদের পিছু পিছু ...

বাদল সরকার ডেকে আনলেন সেই বৃদ্ধাকে। দলের সঙ্গে বসিয়ে খাওয়ালেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন দলের অন্য সবার সঙ্গে।... ক্রমে সেও হয়ে উঠল, অন্তত সেই সফরে তাঁদের দলেরই একজন ... পরে একদিন তাকে নাকি প্রশ্ন করেছিলেন বাদল সরকার : 'আপনি এত পরিশ্রম ক'রে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুড়ে বেড়ান কেন ...' বৃদ্ধা নাকি শুধু বলেছিল 'ভালো লাগে ...'

ঐ গল্পে এসে আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন, আজও যাই ... আমার মনে পড়ে যায় আর এক নাটকপাগলকে যার নাম ভৃগু, যে ঋত্বিকের 'কোমল গান্ধার' ছবির নায়ক ... যার অভিনয়ে অভিভূত হয়ে জমির লড়াইএ সব হারানো বৃদ্ধা ভৃগুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন জমির লড়াইএ নিহত তাঁর একমাত্র ছেলের শেষ স্মৃতিচিহ্ন ...

ভাবি বাদল সরকার আর তাঁর ঐ পথে চলা নাটক কোন স্মৃতি, কোন মায়া, কোন আশা, কোন হাহাকারকে প্রাঞ্জল করেছিল সেই বুড়ি ভিখারিনীর মনে ... ভাবি নাটক তো লিখেন, করেন, লিখবেন, করবেন আরও অনেকেই ... কিন্তু আবার কবে কার নাটকে

সেই বুড়ি ভিখারিনী আপনাকে খুঁজে পাবে প্রকৃতই ... পাবে কি কোনোদিন? নাটক তো লিখেন, করেন, লিখবেন, করবেন আরও অনেকেই ... কিন্তু আবার কবে বাদল সরকার হেন আর এক পর্বতপ্রমাণ ব্যক্তিত্ব এসে দেখিয়ে দিয়ে যাবেন, যে, শুধু নাটককে ভালোবেসে কী ক'রে পথে নামা যায়, জীবিকার, যাপনের সমূহ প্রলোভনকে অস্বীকার করে ...

১৩ মে ২০১১ দিনে বাদল সরকার-এর মৃত্যু হ'ল ... মৃত্যু হ'ল...আবার ভাবি, মৃত্যু হ'ল কি? ভাবি তাহ'লে বেঁচে আছে কারা? বেঁচে আছি কারা? আমরা? তোমরা? যারা প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে আপনার অস্তিত্বের বৃত্তের পরিধিটিকে ছোট করতে করতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছি যাপনযন্ত্রের অতলে? ভাবি কোনওদিন, কোনওদিন বাদল সরকার হেন মহাজীবনের হাওয়ার ধাক্কায় আমাদেরও ভাসিয়ে নেবে না কি কোনও সীমাহীন দিগন্তের দিকে ...

জানি না। তবে আশা করে থাকতে ক্ষতি কী? অপেক্ষা করে থাকতে ক্ষতি কী?

২০/৫/২০১১ ১৮/৬/২০১১

‘হঠাৎ কখন অজানা সে’

১.

এও ঠিক যে, একসময় তাঁকে দিতে হয়েছে নাকচ ক’রে...একসময় তাঁর গায়নে আর সাড়া দেয়নি প্রাণ। তৎসঙ্গে এও কি ঠিক নয় যে, রবীন্দ্রনাথের অনেক অনেক গানের সঙ্গে আমার, আমাদের প্রথম পরিচয় তাঁরই কন্ঠের স্বরে, সুরে ... আর সেই পরিচয়ই কি প্রাথমিকভাবে নির্মাণ করেনি সেই সাঁকোর ইঙ্গিত, যা পার হয়ে, ক্রমে, আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে শান্তিদেবের সঙ্গে, দিনু ঠাকুর বা শৈলজারঞ্জণের সঙ্গে? মনে পড়ে সেই গানগুলি প্রথমবার শোনার অভিজ্ঞতা ... ‘কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি...’, ‘খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে ...’ বা ‘আমার মল্লিকাবনে ...’ আসামের প্রত্যন্ত মফস্বলে, সেই ১৯৮৭- ৮৮ সালে সেই শোনা অবশ্যই সুচিত্রা মিত্রের কন্ঠে...

রবীন্দ্রগান শোনা আমার আরম্ভ হয় ১৯৮৫- ৮৬ সাল নাগাদ, যখন আমি ক্লাস সিক্স বা সেভেনের ছাত্র। মূলত শিলচর রেডিও স্টেশান থেকে প্রচারিত দুপুর ১টা বেজে ১০মিনিটে ‘গ্রামোফোন রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীত’ শোনানোর অনুষ্ঠান শুনে শুনেই। হেমন্ত- সাগর- চিন্ময়- সুচিত্রা- কণিকা ইত্যাদি ‘হিট্’ শিল্পীদের গানই সেখানে বাজত বেশি। জনপ্রিয় হলেও কোনো কারণে দেবব্রতর গান তেমনটা ঐ অনুষ্ঠানে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। এখন মনে হয় হয়তো পর্যাপ্ত সংগ্রহ ছিল না তাদের। মনে পড়ে হেমন্তর কন্ঠে ‘আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে’, ‘আমার ভাঙ্গা পথের রাঙ্গা ধূলায় পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন’, সাগর সেনের ‘আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে’, ‘আমার থাকতে দে’না আপনমনে’ বা চিন্ময়ের গলায় ‘ভালবেসে সখী নিভৃত যতনে’, ‘মোর হৃদয়ের গোপন বিজন

ঘরে' ইত্যাদি গানগুলি ... আমার সেই প্রথম ভালোলাগা রবীন্দ্রগান ... বোঝা না বোঝার আলো আঁধারির কোথাও বেজে যেত গানগুলি কাঠের আলমারির উপরে রাখা ফিলিপ্স্ কোম্পানির রেডিওতে আর একটা মোড়ার উপরে দাঁড়িয়ে সমান সমান হয়ে সেই আলমারির উচ্চতার, শুনে যেতাম গানগুলি ... তাকিয়ে থাকতাম জানালা দিয়ে ... সামনের রাস্তায় ... সেইসব গ্রীষ্মের ছুটির দুপুরে ...

মায়ের ছিল একটি গীতবিতান। সেই কলকাতায় থেকে এম.এ পড়ার সময় কিনেছিল মা। পেছনে লেখা মূল্য ৮.০০ টাকা মাত্র... সেই গীতবিতান খুলে খুলে খুঁজে নিতাম গানের কথাগুলি ... তবুও কি বুঝতাম কিছু? বুঝতাম না-ই বা বলি কী ক'রে? নাহলে ঠিক কিসের টানে সকাল থেকে অপেক্ষায় থাকতাম দুপুর ১টা বেজে ১০মিনিটের সেই অনুষ্ঠানের? নাহলে কিসের টানে ঘন্টার পরে ঘন্টা কাটিয়ে দিতাম গীতবিতানের পাতায় পাতায়?

পরে একটি ব্যাটারি চালিত রেডিও এল দখলে। তখন রাতেও শোনা যেতে লাগল গান ... অনুরোধের আসর খুঁজে খুঁজে ... রেডিও শিলিগুড়ি, রেডিও বাংলাদেশ ঢাকা ... নূতন নূতন নাম নূতন নূতন কন্ঠ ... কলিম শরাফী, সন্জীদা খাতুন, কাদেরী কিব্রিয়া ... 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার', 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে', 'আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে ...' ... রেডিও বাংলাদেশ ঢাকা ভাবলেই মনে পড়ে ঐ গানগুলি আর ঐ শিল্পীজনেরা ... রেডিও শিলিগুড়িতে শুনেছিলাম পংকজ মল্লিক প্রথম, সুবিনয় রায় প্রথম... সুবিনয় রায়ের কন্ঠ গেঁথে গিয়েছিল মর্মে, প্রায় প্রথমবার শুনেই... আর মূল কারণ এই যে, শিবেন্দ্র চক্রবর্তী, বাবা যাঁকে 'দাদু' বলত, আমরা যাঁকে 'বাবু' বলতাম, যিনি আমার ঠাকুর্দার সম্পর্কিত মামা ছিলেন মূলত, ছিলেন আমার ঠাকুর্দারই সমবয়সী... যাঁর হাতে মানুষ হয়েছে আমার আবাল্য পিতৃহীন বাবা ... যাঁর কাছে কেটেছে

আমার শৈশব সেই বাবুও ছিলেন সংগীতশিল্পী। সংগীতশিক্ষক। তবে জীবনের শেষ কয়েকটি বৎসর আর গাইতে পারেননি তিনি ... পক্ষাঘাতে হয়ে গিয়েছিলেন বাক্‌রুদ্ধ ... বাবুর কন্ঠের সঙ্গে, গায়কীর সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল সুবিনয় রায়ের কন্ঠের, গায়কীর ... মনে পড়ে 'যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো প্রভু' ... মনে পড়ে 'লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি ...'

মর্মে আলাদা করে সুচিত্রাকে চিনে নেওয়ার রাতটি মনে পড়ে। চৈত্র বা বৈশাখের রাত। কালবৈশাখীতে উল্টে গেছে ইলেকট্রিকের পোস্ট, উপড়ে গেছে গাছপালা ... স্থানে স্থানে ... ফলত বিজলী নেই শহরে। আকাশ প্রস্তুতি নিচ্ছে আরেক পশলা বর্ষণের। পড়াশোনার পাট চুকিয়ে অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছি মায়ের ডাকের 'খেতে আয়্ ... রান্নাঘরে আয় ...' আর ব্যাটারিচালিত রেডিওর নব্ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুঁজে চলেছি রবীন্দ্রগান ... যদিও বৃষ্টি বাদ্‌লার রাত তবুও গরম। তাই জানালা দুটোই খোলা। সেই খোলা জানালা দিয়ে চোখ দেখছে অন্ধকার আর আঙ্গুল খুঁজে চলেছে গান রেডিওর নব্ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ... এমন সময়ই শোনা গেল সেইগান ... ইথার তরঙ্গে ভেসে আসা ... তবে বৃষ্টিতে, মেঘে বেঁকে আসছিল সুর, দূরে সরে যাচ্ছিল সুর ... তথাপি গানের কথাগুলি আর তার আড়ালে এক আকূল কন্ঠ আমার গহনে পেতে চাইছিল কে জানে ঠিক কোন অপরূপ অবয়ব...

পরে আবিষ্কার করেছি ঐ গানের ওই রেকর্ডিং ৭০ এর দশকের অর্থাৎ যখনও সুচিত্রা গাইতেন গলা খুলে ... গাইতেন সেই মেঠো ঢঙ্গে যে মেঠো ঢঙ্গ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের, দিনু ঠাকুরের, শান্তিদেবের ... তখনও সুচিত্রা অগ্রগণ্যা হয়ে পড়েননি 'ড্রইংরুম্ রবীন্দ্রসংগীতের' ...

ওই গাওয়া সেই আমলের। সেই সুচিত্রার ... সেই গান ' সকল জনম ভ'রে ও মোর দরদীয়া ...'

২.

আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত রাজাদা। সেও আরেক গানপাগল মানুষ। আমার চেয়ে বয়সে বছর পাঁচের বড়ো। মনে আছে একদিন কোথায় যেন যাচ্ছিলাম রাজাদার সঙ্গে। ক্লাস নাইন টেনে পড়ি তখন। রাজাদা পড়ে ইঞ্জিনীয়ারিং। হোস্টেলে থাকে। হপ্তায় দু' হপ্তায় আসে বাড়িতে। তেমনি এসেছে একবার। সম্ভবত গ্রীষ্মকাল, কেননা ঘাম হচ্ছিল খুব। চলতে চলতে হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়ল রাজাদা।

'গানটা শুনছিস্...'

ভরাট কন্ঠের একটা সুর ভেসে আসছিল ঠিকই। কানখাড়া করে শুনে মনে হল রাগাশ্রয়ী বাংলা গান।

রাজাদা বলল 'অখিল বন্ধু ঘোষ!' তারপরই সটান ঢুকে পড়ল যে বাড়ি থেকে গানটা ভেসে আসছে বলে মনে হচ্ছিল সেই বাড়িতে।

'কাকে চাই?'

দরজা খুলে দাঁড়ালেন এক সৌম্যকান্তি বৃদ্ধ।

'গান শুনতে এসেছি ...' বলল রাজাদা। বৃদ্ধের ঠোঁটে খেলে গেল হালকা হাসির রেখা। বললেন 'এসো'...

গান বাজছে হিস্ মাস্টার্স ভয়েসের রেকর্ড প্লেয়ারে। শ্রোতা আমরা তিনজন। বিপত্নীক বৃদ্ধ সারাদিন বাড়িতে থাকেন একা। পুত্র-পুত্রবধূ উভয়েই চাকুরে। নাতিটি যায় ইস্কুলে। গানে গানে ভেসে যায় বৃদ্ধের সারাদিন ...

সেই গান রেকর্ড করে আনল রাজাদা। যেহেতু রেকর্ড প্লেয়ার নেই, যেহেতু বাজাতে হবে ক্যাসেট প্লেয়ারে তাই ক্যাসেটেই টেপ্ করা হল গানগুলি । সেই রেকর্ডিংয়ের যে প্রযুক্তি ও প্রয়োগ সে আরেক ব্যাখ্যান ...

সেই রাজাদা ছিল সুচিত্রা মিত্রের আরেক মুগ্ধ শ্রোতা। হাতখরচের টাকা বাঁচিয়ে সে মাসে অন্তত একটা ক্যাসেট কিনত। কিনতাম আমিও। তখন আমারও হাতের আওতায় এসেছে একটি ফিলিপ্স্এর টেপ রেকর্ডার। তবে আমার সমস্যা ছিল আমাদের শহর করিমগঞ্জের তুলনায় রাজাদার হোস্টেলের শহর শিলচরে ক্যাসেটের দোকান ও আমদানি ঢের বেশি। ফলে রাজাদাকে চমকে দেওয়ার মতো ক্যাসেট কেনার পরিকল্পনা আমার কদাপি হলই না আর কার্য্যকারী ... রাজাদার সংগ্রহ করা সুচিত্রা মিত্রের ক্যাসেটে শোনা গানগুলির মধ্যে মনে পড়ে ‘ক্ষত যত ক্ষতি তত ... মিছে হতে মিছে ... নিমেষের কুশাংকুর ...পড়ে রবে নীচে ...’ ... মনেপড়ে ‘পান্থ তুমি পান্থ জনের সখা হে...’, ‘আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে’ , ‘যতখন তুমি আমায় বসিয়ে রাখো বাহির বাটে ...’

রবীন্দ্রনাথের দর্শনের গভীর, গভীরতর উন্মোচনের পথে মানসযাত্রার সেই ছিল ঊষালগ্ন। গীতবিতানের পাতায় গানগুলির প্রতিটি শব্দ, বাক্য আর সুচিত্রার কন্ঠে তাদের উচ্চারণ আমার সেদিনের বয়ঃসন্ধির ‘আমি’কে যেন দেখিয়ে দিয়েছিল এক নূতন

দিগন্ত ... যে-দিগন্তের দিকে আমার অন্তর্গত যাত্রা অদ্যাবধি...যেমন এই গানটি :

আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে।

দিনের কর্ম আনিনু তোমার বিচারঘরে।

যদি পূজা করি মিছা দেবতার, শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার,

যদি পাপমনে করি অবিচার কাহারো ‘পরে,

আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে।

লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি দুখ, ভয়ে হয়ে থাকি ধর্মবিমুখ,

পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ ক্ষণেক-তরে’

তুমি যে জীবন দিয়েছ আমার কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়,

আপনি বিনাশ করি আপনায় মোহের ভরে ,

আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে।

কোনো গভীর মেটাফিজিক্সের ইঙ্গিত হয়তো পেয়েছিলাম মনের কোথাও, তবে তারও আগে এই গান আমার কাছে প্রথম সুস্পষ্ট করে দিয়েছিল ভালো আর মন্দের সীমারেখা ... গর্হিত কার্যের একটি পরিষ্কার তালিকা পেয়েছিলাম সেদিন ...

যদি পূজা করি মিছা দেবতার, শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার,

যদি পাপমনে করি অবিচার কাহারো পরে

লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি দুখ ভয়ে হয়ে থাকি ধর্মবিমুখ

পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ ক্ষণেক তরে

তুমি যে জীবন দিয়েছ আমার কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়

আপনি বিনাশ করি আপনায় মোহের ভরে

তখন বা এখনও যে উপরি উল্লিখিত গর্হিত কার্যগুলি থেকে সতত বিরত থাকতে পেরেছি এমন দাবি করবার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবে যখনই ঐ কার্যগুলি আমাদ্বারা সংঘটিত হয়েছে, আমি মনে মনে জেনেছি আমি হেরে যাচ্ছি, আমি সরে যাচ্ছি আমার প্রকৃত পথ থেকে ... সেই প্রথম জানলাম দেবতাও মিছা হয় আর মিছা দেবতাকে পূজা করা অপরাধ ... জানলাম মিথ্যা আচারের কথা ... তাই শেষ পর্যন্ত কাগজে-কলমে যেমন মানতে পারলাম না তথাকথিত আধুনিকতাকে বা উত্তর-আধুনিকতাকে, তেমনি চলতে পারলাম না মার্ক্সবাদী আচারের ফ্যাশনধন্য পথে... রবীন্দ্রসাহিত্যে এই কথাগুলি ঘুরেফিরে এসেছে বারবার। এসেছে নানা অনুষঙ্গে। তথাপি যেহেতু সেই আমার প্রথম শোনা, আমার প্রথম অনুভব, তাই তার কাছে আমার যাওয়া ফিরেফিরে ...বারেবারে ... আর ঐ যাওয়ায় আশি-র দশকের শেষের সুচিত্রা বা আরও পরের সুচিত্রা না থাকলেও ঐ সুচিত্রা অবশ্যই রয়ে গিয়েছেন যাঁর কন্ঠে আমি শুনেছিলাম সেই কথাগুলি ... প্রথমবার ...

৩.

আরেকটি দিনের কথা মনে পড়ে। সেও সেই বয়ঃসন্ধির সময়েরই। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। সঙ্গীসাথী যারা ছিল সবাই মিলে গিয়েছে বেড়াতে। আমার অনুমতি মেলেনি। ফলে আমি বাড়িতে।

একা। যেন আমি এই শহরেই একা। রাজাদারও কী যেন পরীক্ষা সামনে। তাই বাড়ি আসা হয় না তারও। আমার সঙ্গী বলতে বই আর গান। মাঝে মাঝে বেরিয়ে যাই। সাইকেলে চেপে চক্কর লাগিয়ে আসি শহরে। সেই চক্করে একাকীত্ব বাড়ে বৈ কমে না ...

এরই মধ্যে এসে গেল বর্ষাকাল। তুমুল বৃষ্টিবাদল। সেদিন সকাল থেকেই মন ভালো লাগছিল না। তখন কি আর জানতাম যে ঐ অকারণ মনখারাপ বয়ঃসন্ধিরই আরেক লক্ষণ? বিভূতি রচনাবলী নিলাম। মন বসল না। নিলাম পরশুরাম। ভাল্লাগল না। আগাথা ক্রিস্টিতেও তাই ...ভাবলাম সাইকেলে চেপে একটা চক্কর মেরে এলে ... কোনো গলিঘুঁজিতে লুকিয়ে একটা দুটো সিগারেট টেনে এলে হয়তো ঠিক হবে মন মেজাজ ... তখনই তোড়ে নামল বৃষ্টি ...

দুপুরের দিক। বৃষ্টি ধরেছে ঠিক। তবে থামেনি। এদিকে চলে গেছে কারেন্ট। নাহলে টেপ রেকর্ডারটা চালিয়ে গান শোনা যেত আর নাহলে টিভিটা খুলে অন্তত দেখা যেত কী চলছে... অগত্যা সেই প্রায় ভুলে যাওয়া ব্যাটারিচালিত রেডিওর শরণ নিতে হল ... সেটাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বসলাম আমাদের বসবার ঘরে। সারাবাড়িতে ঐ কোঠাটিতেই শুধু দুটো কাচের জানালা আছে ... বাকি সমস্ত কোঠার জানালা দরজা বন্ধ। বৃষ্টির ছাট ঢোকে ...

বাইরের কোঠার কাচের জানালার পর্দা সরিয়ে গিয়ে বসলাম একটা চেয়ারে। বাইরে তখনও বৃষ্টি। জানালার কাছে ছোটো ছোটো ফুলগাছের বৃষ্টিভেজা মাথা ... আকাশে মেঘ ... ব্যাটারিচালিত সেই রেডিওর নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুঁজছি যদি পাওয়া যায় শোনার মতন কিছু ... এই স্টেশনে যদি চলছে অতি খেজুরে আধুনিক গান তো অন্যটাতে কোন অচেনা ভাষায় খবর ...ভাবছি এটাও বন্ধ করে এবার গিয়ে শুয়েই পড়ব ... ঠিক তখন ... হ্যাঁ ঠিক তখনই শুনলাম ... কোন

স্টেশন বোঝা গেল না তবে শুনলাম ... আসরের শেষ শিল্পী সুচিত্রা মিত্র ... অনুরোধ আপনাদের আজিমগঞ্জ থেকে শেফালি, গীতালি ... ইত্যাদি ইত্যাদি ... টেপ রেকর্ডার আসার পর থেকে রেডিওর সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় ছিল না বললেই চলে তাই ঠিক ধরতে পারলাম না কোন ষ্টেশন ... আর তখনই বেজে উঠল গানটি ... পরে ঐ গান শুনেছি বহুবার দেবব্রত বিশ্বাসের কন্ঠে ... ভালোও লেগেছে খুব ... তথাপি ঐ দিনের ঐ শোনাটি আমার চিরকৃতজ্ঞ হয়েআছে সুচিত্রা মিত্রর কাছেই ...

যেন আমার সেই বাদলা দিনের মনখারাপই সুরের অবয়ব পেল তাঁর সেদিনের সেই কন্ঠে, সেই গানে :

'এই শ্রাবণ- বেলা বাদলঝরা যূথীবনের গন্ধে ভরা ...'

একটু দ্রুতলয়ে দেবব্রত গেয়েছেন গানটা। সুচিত্রা গেয়েছেন অতি ধীরলয়ে ... হায় সেদিন আমার মন ঐ গানের ঐ ধীর লয়টিতেই পেয়েছিল আশ্রয়, পেয়ে গেল আশ্রয় ... অন্তরায় এসে সুচিত্রা গাইলেন :

'হঠাৎ কখন অজানা সে আসবে আমার দ্বারের পাশে

বাদল সাঁঝের আঁধার মাঝে গান গাবে প্রাণ পাগল করা

এই শ্রাবণ- বেলা বাদলঝরা যূথীবনের গন্ধে ভরা ...'

গান থামল। শেষ হল অনুরোধের আসর। কোন স্টেশন জানার ইচ্ছা হল না। বন্ধ করে দিলাম রেডিও। কারণ তখন আমার মনেপ্রাণে বেজে উঠেছে সেই অন্তহীন প্রতীক্ষা যার শেষে 'হঠাৎ কখন অজানা সে আসবে আমার দ্বারের পাশে ... বাদল সাঁঝের আঁধার মাঝে গান গাবে প্রাণ পাগল করা ...'

তারপর জীবনে এসেছে গেছে আরও আরও বর্ষার দিন, বর্ষার রাত ... শুনেছি রবীন্দ্রনাথের আরও আরও বর্ষার গান ... শুনেছি অনেকের কন্ঠে ... শুনেছি সুচিত্রার কন্ঠেও তথাপি ঐ একটি বর্ষার দুপুর, তার আনন্দ ও বিষাদ ঘিরে আজও বেজে চলেছেন সুচিত্রা মিত্র। সুচিত্রা মিত্রই শুধু ...

০৯/০১/২০১১

‘সবচেয়ে বেশি রূপ ...সব চেয়ে গাঢ় বিষণ্নতা’

সহজ পাঠ-এর সঙ্গে *পথের পাঁচালী*, *পথের পাঁচালী*-র সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনানন্দ কোথায় যে যায় একাকার হয়ে ...রাজগঞ্জের ঘাটে বাঁধা মধুমাঝির নৌকার ছবি কখনো ফিরিয়ে আনে *বুড়ো আংলা*-র রিদয়কে ...কখনো অপুকে ...সেই নিশ্চিন্দিপুর তার সকাল, তার সন্ধ্যা, তার বাঁশঝাড়, তার আমবন...যেন ক্রমে ক্রমে অবয়ব নেয় বাংলা, আবহমানের বাংলা...রূপসী বাংলা...একমাত্র যার রূপে মুগ্ধ হয়েই সম্ভব হয় ঐ স্পর্ধিত, সবুজ, সজল প্রত্যাখ্যান : তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও, আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব...

এখন দুঃখ বলতে একটাই অতীতকে হারানোর দুঃখ ...কোনো ব্যক্তিগত অতীত নয় ...একটি জাতির অতীত ...একটি ভাষার অতীত ...এখন ক্ষতি বলতে একটাই ...নিজ সন্ততিতে তার আবহমানের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে না পারবার ...বেজে ওঠে কথাগুলি ...চরে বসে রাঁধে ঙ চোখে তার লাগে ধোঁয়া...সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে ছবিগুলি ...নন্দলালের...কখনো মাটির উনুন জ্বালিয়ে রাঁধতে বসেছে ঙ, কখনো কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি চলেছে মেঠো পথে ...কবরের গায়ে আঁকা এপিটাফহেন ছবিগুলি নিয়ে আসে অনাদিকালের বিষণ্নতা। বয়ে আনে নিরবচ্ছিন্ন পরাজয়ের কাহিনি। কারোর একার নয়। একটি সভ্যতার। একটি জাতির।

আমাদের সন্ততিরা দেখবে না মাটির উনুন, দেখবে না জ্বালানি কাঠ বোঝাই ঠেলাগাড়ি, দেখবে না প্রতিটি গৃহস্থের নিজস্ব পুকুরে নুয়ে পড়া আম্রবৃক্ষের মহিমা, শুনবে না জন্মান্তরের সেই ডাক ‘আ চই চই চই...’ সন্ধ্যাবেলা সেই পুকুরের পারে...হাঁসেদেরকে ফিরিয়ে আনার...

নিজ অতীতের বর্ণনায় নিজ সহৃদয় পিতার কথা বলতে গিয়ে সন্ত অগাস্তিন লিখেছেন : Yet the same father of mine took no trouble at all how I was growing ...or whether I was chaste or not. He cared only that I should have a fertile tongue...' কেননা রাজকর্মচারী বৃত্তিতে রসনাই কর্মচারীর মূল সহায়...আর পিতা চেয়েছিলেন অগাস্তিন যাজকই হোন ভবিষ্যতে। - অগাস্তিনের পিতাহেন আমরাও সন্ততির বহিরঙ্গকে ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল করবার তাগিদে ছিনিয়ে নিচ্ছি তার অন্তর্গত আশ্রয়ভূমির সংকেতগুলি। বস্তুসাফল্যের মোহে ভুলে ভিটেমাটি ছেড়ে এসে আমরা হয়েছি অভিশপ্ত, হয়েছি উদ্বাস্তু আর সন্ততিকেও টেনে আনছি, ক্রমে, সেই অভিশাপের আবর্তে...

যে-বালক দিশাহারা হয়ে দৌড়ে বেড়াল না রঙ বেরঙ প্রজাপতির পাখার ইশারায়, যে-বালক হেমন্তের মাঠ থেকে নিজহাতে খড় কেটে আনল না তার পৌষ সংক্রান্তির 'মেরামারি'র ঘর তৈয়ার করতে, যে-বালক আরো অসংখ্য বালক বালিকার সঙ্গে তেল চুকচুকে চুল নিয়ে দাঁড়াল না হতশ্রী ইস্কুলের বারান্দায়, দেবী সরস্বতীকে অঞ্জলি দেওয়ার পংক্তিতে, আষাঢ়ে শ্রাবণে ঘনায়মান মেঘের দিকে চেয়ে থেকে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে দেখল না যে-বালক, সে-বালক বস্তুসাফল্য যা'ই অর্জন করুক ভবিষ্যতে, তবু সে পঙ্গু। বিকলাঙ্গ। না-মানুষ।

মা মরা ছেলে কাজলকে অপু নিয়ে রেখে এসেছিল সেই নিশ্চিন্দিপুরেই ...যে নিশ্চিন্দিপুর তার শোণিতে বহমান...সেখানে। সে বিভূতিভূষণের অপু। আজকের অপু ঋণকর্জ করে হলেও কাজলকে রেখে আসবে কোনো মস্ত ম্লেচ্ছ বিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্তী হোস্টেলে। সেও মহানুভব। যেমন ছিলেন সন্ত অগাস্তিনের পিতা। তৎকালে তাঁদের থেকে বহু বেশি বিত্তশালী পরিবারের পিতারাও

সন্ততির শিক্ষার জন্য অতটা ব্যয় করতেন না। কিন্তু ঐ শিক্ষা কোন শিক্ষা? 'He cared only that I should have a fertile tongue...'...অদৃষ্টের আশীর্বাদ অগাস্তিন শনাক্ত করেছিলেন ঐ ভ্রমকে। অন্যথায় সন্ত অগাস্তিন না হয়ে তিনিও মিশে যেতেন তৎকালীন ঐ সব অসংখ্য ওজস্বী রাজকর্মচারীর দলে যাদের নাম আজ মনে রাখেনি শ্মশানে কবরে জাত শৃগাল সারমেয়দের মলজাত ধূলিকণাও ...পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন এমন এক পিতা যিনি পুত্রকে ইস্কুল ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন হিমালয়ের শোভা দেখাতে ... এ না হলে হয়তো রবীন্দ্রনাথ হতে পারতেন না রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতার্থে...প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলি শিশুর অভিভাবকত্ব করতে হয় যাদের, করতে হবে যাদের, তাদের অবশ্যপাঠ্য রবীন্দ্রনাথের ঐ *জীবনস্মৃতি* ...শিশুপালনের এ হলো অন্তিমতম অভিধান ...

যদিও সকলই আমি পড়েছিলাম, বুঝেও ছিলাম কিছুদূর, তথাপি আমাকেও হতে হয়েছে উদ্বাস্তু। সন্ততির ললাটে লিখে দিতে হয়েছে বনসাই হওয়ার অভিশাপলেখা। ঐ পাপ, ঐ বেদনা নিয়ে হারিয়ে যাই রূপসী বাংলায় ...ফিরে আসে দৃশ্য, ফিরে আসে কাহিনি ...

যেইখানে কল্কাপেড়ে শাড়ি প'রে কোন এক সুন্দরীর শব
চন্দনচিতায় চড়ে আমের শাখায় শুক ভুলে যায় কথা -;
যেখানে সবচেয়ে বেশি রূপ সবচেয়ে গাঢ় বিষণ্নতা -;
যেখানে শুকায় পদ্ম বহুদিন বিশালাক্ষি যেখানে নীরব -;
যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিককুমার
কাঁকন বাজিত, আহা, কোনোদিন বাজিবে কি আর

টের পাই এ এক সভ্যতার গল্প, যে-সভ্যতা বিনিঃশেষ হয়ে গেছে। শুধু ভূগোলের পৃষ্ঠা থেকে নয়, মানুষের- মানবের চৈতন্য থেকেও। আজকের অপু যদি তার কাজলকে নিয়ে ঐখানে আশ্রয় চায় তাহলে সে বিচূর্ণ হয়ে যাবে আজকের নব সভ্যতার আঘাতে...মিশে যাবে বিচূর্ণ সভ্যতার এক ফসিল জগতে ... আমি ভীত হই। সন্ততির ঘুমন্ত মুখে দেখি অভিশাপের ছায়া ...আমি চোখ বন্ধ করি ...আমার চোখে, ক্রমে ভেসে উঠতে থাকে মোতিবিল, ছোটোনদী, বক্সিগঞ্জের পদ্মাপার ... নন্দলালের ছবি ... রবি ঠাকুরের ছন্দ... অকস্মাৎ মনে হয় বিগত কোনো সভ্যতার ফসিল নয় এরা ... এরা বর্তমান ... শুধু ইচ্ছার জোরে না হোক্, ইচ্ছার সঙ্গে সাহসকে মিলিয়ে সন্ধান চালালে পাওয়া যাবেই ঐ ছোটনদী, মোতিবিল, মধুমাঝি আর কুমোরপাড়ার গরুর গাড়িগুলিকেও ... মনে হয় কাজলের, দুর্গার হাত ধরে একদিন সত্যই গিয়ে দাঁড়ানো যাবে ঐ নিশ্চিন্দিপুরে ...ঐ মোতিবিলের কিনারে ... কানে আসে কে যেন গায় :

হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে যাহা-কিছু সব আছে আছে আছে

নাই নাই ভয়, সে শুধু আমারই, নিশিদিন কাঁদি তাই।

টের পাই নিঝুম রাত্রির ভিড়ে অভিশপ্ত আমি আর গৃহহীন আমার সন্ততি একপাশে এই ঘাতকসভ্যতা আর আরেক পাশে *সহজ পাঠ*, *পথের পাঁচালী*, *বুড়ো আংলা*, *রিদয়*, *রূপসী বাংলা*...টের পাই জীবনানন্দের অক্ষরগুলি, নন্দলালের ছবিগুলি এপিটাফ নয়। তারা প্রতিমা। তারা অক্ষয় । বছর বছর বিসর্জনেও।

২৮/১২/২০০৪ - ৪/৮/২০১০, বেঙ্গালোর

চার্চরোড কথা

একটি দুপুরের কথা মনে পড়িতেছে। কি কারণে যেন ইস্কুল ছুটি হইয়া গিয়াছিল তাড়াতাড়ি। ক্লাস সিক্স- সেভেনে পড়ি। দুপুর দেড়টা নাগাদ হইবে। ফিরিয়া আসতেছিলাম 'চার্চ রোড' ধরিয়া।

আমাদের মফস্বলে, তাহার একই তারে গাঁথা যাপনসংগীতে,'চার্চ' এই শব্দটি ছিল যেন এক মূর্ছনার মতো। শহরের যে দিকে ঐ 'চার্চ' ঐ দিকেই ছোটো এক টিলা । টিলার শরীর বাহিয়া চলিয়া গিয়াছে সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলে 'থানা'। উর্দিপরা পুলিশ। অপর দিকে মফস্বলি ডাকবাংলা। থানার সিঁড়ির নীচেই দুই বিরাট বৃদ্ধ বনস্পতি। তাহাদের শরীর হইতে নামিয়া আসিয়াছে অসংখ্য ঝুড়ি। ঐ খানে রাস্তা দুই ভাগ হইয়া একটি সোজা চলিয়া গিয়াছে 'চার্চ রোড' ধরিয়া। অন্যটি, একটি ছোট্ট নালার কিনার ঘেঁষিয়া গিয়া মিলিয়াছে বড় রাস্তায়, যাহার সমান্তরালে বহিয়া চলিয়াছে, অদ্যাপি, খাল, 'নটীখাল'... 'আমাদের ছোটোনদী'...তবে আমাদের মফস্বলি যাপনকাহিনিরই মতো তাহার শরীরেও কোনো বাঁক নাই...

যেখানে ঐ রাস্তাদের ভাগাভাগি সেইখানে ছিল এক বিরাট পুকুর। ঐ পারে বাঁধানো ঘাট। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই, যে, আমরা ঐ ঘাটে কোনোদিন কাহাকেও দেখি নাই কোনো কাজ করিতে...কাপড় কাচিতে বা স্নান করিতে...পুকুরের সীমানা পারাইয়া আরেকটি রাস্তা...আরেকটি গৃহস্থপাড়া...যাহার নাম 'থানা রোড', যাহা দিনের সব সময়েই ছায়ায় ঢাকা...নারিকেল গাছের ছায়া, সুপারি গাছের ছায়া...বাতাসের গমনাগমনে তাহাদের নড়াচড়া...শিথিল, মন্থর...

ঐ 'থানা রোড'কে বামদিকে রাখিয়া সোজা চলিলেই আসে 'চার্চ রোড'। চার্চের সীমানা যেখানে শুরু সেইখানের বিপরীতে,রাস্তার পরপারে তখন ধুধু মাঠ। অনেক আগাইয়া গিয়া দুই- তিনটি বাড়ি। তাহাদের একটি আবার পরিত্যক্ত, বহুদিনের।

চার্চের সীমানার ইটের দেওয়াল ঘিড়িয়া বাঁশঝাড়ের সারি। ফলে ভিতরের কিছুই প্রায় দেখা যায় না চোখে। অতএব কৌতূহল যায় আরো বাড়িয়া। বাঁশগাছের পাতাগুলি বাতাসে দুলিয়া ওঠে। শব্দ হয় শির্‌শির্‌। সেই পাতাদের নিশান পারাইয়া চোখেপড়ে গির্জার চূড়া। মফস্বলি হইলেও জাতে সে যেহেতু 'গথিক' সুতরাং কল্পনাকে আস্কারা দিতে সে বাধ্য...ঐ গির্জার ঐ চূড়াটির দিকে চাহিয়া মনে হইত যেন 'কাউন্ট অফ মন্টিক্রিস্ট'র সেই 'ফাদার ফারিয়া' ছিলেন ঐখানেরই বাসিন্দা...যেন 'হান্‌চব্যাক্‌ অফ নোটরদাম'এর সেই 'এসমারেলডা'ও ছিল এইখানে ...থাকিবে এইখানে...যে বাতাসে দুলিয়া উঠিত ঐ বাঁশঝাড়গুলি সেই বাতাসকে মনে হইত মহাসাগরের পাড়ের বাতাস... 'টেল্‌স্‌ অফ শেক্সপীয়ার' মনে পড়িত...মনে পড়িত 'মিরান্দা'...

প্রাচীরের মাঝামাঝি আসিলে গির্জার ফটক। লোহার ফটক। দেখা যাইত সেই গথিক গির্জা- পুরুষকে। দেখা যাইত, মাঝে মধ্যে, স্কার্ট পড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ানো দুই একটি ললনাকে...যাহারা, আমরা জানিতাম, নিকটবর্তী রাজ্য অর্থাৎ, নাগাল্যান্ড- মিজোরাম- মেঘালয়ের...তথাপি ত্বকের সামান্য উজ্জ্বলতা এবং গির্জা- পুরুষের সম্মানে তাহাদিগকেই মনে মনে সাজাইয়া লইতাম 'এসমারেলডা' বা 'মিরান্দা'র ছাঁদে...

ফটকের অপর পার্শ্বেও প্রাচীর। সেই প্রাচীরও ঘেরা বাঁশঝাড়ের সারিতে। তাহার পরে একটি গলি। তাহার পর বাড়ি

‘বাপ্পা ভট’দের, যে-বাড়ির যুবতী মেয়েগুলি তৎকালীন মফস্বলের ‘হেমা’ ‘শ্রীদেবী’...ঐ রাস্তাটিকে মর্মে রহস্যময় করিতে তাহাদেরও অবশ্যই ছিল অবদান ...রোজই ভাবিতাম আজ দেখিব তাহাদের অন্তত একজনকেও। কিন্তু তাহারা তো দূরস্থান, ঐ পাড়ায় কোনো জাগ্রত মানুষ দেখি নাই কদাপি...বাদলার দুপুরে কখনো ঐ পথে আসিলে মনে হইত যেন এক নিদারুণ ঘুমপুরী...ঐ পথে যাতায়াত করিলে ইস্কুলে যাইতে আসিতে একটু বেশি হাঁটা পড়ে বলিয়া বিশেষ কেহই উহাকে বাছিয়া নিত না নৈমিত্তিক পথ হিসাবে। ফলে আমারই একচ্ছত্র সাম্রাজ্য ছিল ঐ পথ...

সেইদিনও আসিতেছিলাম ঐ পথেই। একলা। যথারীতি। থানা রোড ছাড়াইয়া গির্জার কোনায় আসিবামাত্র ঘটিল সেই অদ্ভুত ঘটনা...আমি যেন সম্বিৎ হারাইলাম...বাঁশ ঝাড়গুলি যেন সত্যই দুলিয়া উঠিল সামুদ্রিক বাতাসে...এই মফস্বল, এই একটানা সুরের যাপন, ইস্কুলঘর সমস্তই যেন পাখা মেলিয়া দিল রবীন্দ্রকবিতার সেই বলাকাহেন পাখা মেলিয়া দেওয়া পর্বতশ্রেণির মতো...আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম... দাঁড়াইয়াই রহলাম...যেন এতাবৎ দাঁড়াইয়াই আছি ঐখানে যেখানে বাঁশগাছের পাতাগুলি আন্দোলিত হইতেছে সামুদ্রিক বাতাসে আর তাহাদের ফাঁক- ফোকর দিয়া দেখা যাইতেছে সেই গির্জার চূড়া, সেই গির্জাপুরুষ, যিনি আগলাইয়া রাখিয়াছেন, এই মফস্বলেই, ‘এসমারেলডা’ ও ‘মিরান্দা’দের ...তাঁহার পিছনে আকাশ, শরতের আকাশহেন আবছানীল...কয়েক খণ্ড মন্থর মেঘ...আর আমি ...আর থানারোডের কোনো গৃহস্থবাড়ির রেডিও বা গির্জা- পুরুষের কোনো মফস্বলেই, ‘এসমারেলডা’ বা ‘মিরান্দা’র বেটারিচালিত ট্রানজিস্টরে সেই গান...সেইগান আগেও নিশ্চয় শুনিয়াছি, পরেও শুনিয়াছি অসংখ্যবার...তবু ঐ দিনের মতো করিয়া আর শুনি নাই কোনোদিন...পরে শুধু শুনিয়াছি ঐ দিনটির ‘শুনা’টিকে

স্মরণ করিতে...ফিরিয়া যাইতে ঐ দিনে, ঐ মুহূর্তে...যদিও জানিয়াছি ঐ দিন আর নাই ...তবুও...

অদ্যাপি যখনই শুনি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে, ঐ গানখানি, ঐ 'ওগো কাজলনয়না হরিণী, তুমি দাও না ও দুটি আঁখি...ওগো গোলাপ পাপড়ি মেলোনা ...তার অধরে তোমাকে রাখি...' আমার চোখে ভাসে না, মনে আসে না কোনো 'কাজলনয়না হরিণী'র স্মৃতি...আমি হারাইয়া যাই সেই অসময়ে ইস্কুল ছুটি হওয়া দুপুরের গহনে...সেই সামুদ্রিক বাতাসে হাহাকার তোলা বাঁশ পাতার মর্মরে ... 'চার্চ রোড' নামক সেই রহস্যময় রাস্তাটির অতলে...

নিদাঘ- কাহিনী

লঙ্গাই নদীর উপরের কাঠের ব্রিজটি তখনও উপযুক্ত ছিল লরি বহিবার। বাস বহিবার। সেই বাসগুলিকে আমরা বলিতাম ‘মেটাডর’। ছোটো ছোটো সাদা গাড়িগুলির আকৃতি ছিল এম্বুলেন্স গাড়িগুলিরই মতন। ভিতরে রোগীর শয্যার পরিবর্তে ছিল বসিবার সিট। দুইদিকে ছিল কয়েক সারি ছোট ছোট জানালা। সেই জানালাগুলি দিয়া দেখা যাইত সিট পাইয়া আরামে যাওয়া যাত্রীদের উদাসীন মুখগুলি। দেখা যাইত ঠেলাঠেলি ভিড় করিয়া দণ্ডায়মান জনতার অবয়বের বিমূর্ত অংশ। ছাদের উপরে বন্ধনরত অবস্থায় ঝুলিত মাটি কোপানোর কোদাল, বাঁশের ঝুড়ি, ভরা কিংবা খালি মুর্গির খাঁচা। কখনো কন্ডাকটর ছোকরাকেও দেখা যাইত ঐ ছাদেই উপবিষ্ট।

বাসগুলি আসিত লঙ্গাই নদী পারাইয়া, চাবাগান ছাড়াইয়া ...লঙ্গাই নদী পারাইয়া বাজার। লঙ্গাই বাজার। বেগুন তাহার বিখ্যাত। সুস্বাদু পুঁটিমাছ। ভোরবেলা জাগিয়া উঠে বাজারটি। ঘুম যায় দিনভর। আবার জাগে সন্ধ্যায়। কেহ কুপি জ্বালায়। কেহবা সরকারি খুঁটি হইতে ‘হুক্’ লাগাইয়া জ্বালে ষাট কিংবা একশো পাওয়ারের বাল্‌ব্। কেহ জ্বালায় ‘পেট্রোমাক্স’। সন্ধ্যা সাতটা হইতে না হইতে নিভিয়া যায় ‘পেট্রোমাক্স’, নিভিয়া যায় ষাট কিংবা একশো পাওয়ারের বাল্‌ব্। কুপিগুলি কেবল থাকে জ্বলিতে। ঝাঁপতোলা দোকানে দোকানে খুলিয়া যায় চোলাই মদের ঠেক। টক্ টক্ গন্ধে মম করে চারিদিক ...বাজারের পিছনে, নদীর শরীরে, কুপির ছায়া কাঁপিতে থাকে। দুলিতে থাকে ঘাটায়- আঘাটায় বাঁধা ছোটবড়ো নৌকাগুলি...সেই বাসগুলি ফিরিতে থাকে একে একে...রাস্তার পীচ

উঠিয়া গিয়াছে বহুযুগ...ফলে বাসের গমনাগমন সূচিত হয় ধূলির উদ্দামতায় ...

ছুটির দিনের দ্বিপ্রহরগুলি মনে পড়ে। যেহেতু আমাদের ছোট বাড়িটি ছিল একেবারেই বড় রাস্তার ধারে, ফলে একেকটি বাস কিংবা লরি চলিয়া যাইবার পরের ঘ্রাণ, পেট্রল- ডিজেলের, সঙ্গে ধূলির আক্রমণ ...বাতাসে ঘরের পর্দাগুলির উড়িয়া যাওয়া...সমস্ত মিলাইয়া ঐ যাতায়াতগুলি আমার মর্মে লইয়াছিল এক 'রাজসিক গমন'-এর চরিত্র। একটি গেলেই কখন আরেকটি আসিবে, তাহার ছাতে কী প্রকার জিনিস থাকিবে অথবা মানুষ, এইসব ভাবনা লইয়া সামনের বারান্দায় বসিয়া 'ছুটির পড়া' করিবার উপক্রম করিতাম...

গ্রীষ্মদুপুরগুলির কথা মনে পড়ে। দুপুরে সবার খাওয়া হইলে বাবা বিছানায় উঠিত বই কিংবা খবরকাগজ লইয়া। মা-ও, ক্রমে, কাজ সারিয়া বিছানা লইত। বাবা চেষ্টা লইত আমাদের দুই ভাইকেও দিবানিদ্রায় নিযুক্ত করিতে। যে সকল দিনে ঐ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইতাম সেই সকল দিনে কিনারের কোঠায়, মাটিতে মাদুর বিছাইয়া খুলিয়া লইতাম 'শুকতারা', 'আনন্দমেলা' কিংবা ইস্কুলের কোনো বন্ধুর নিকট হইতে লইয়া আসা কোনো বই।

যেন অফুরান এই গ্রীষ্মের দুপুরগুলি। কখনো হাওয়া আসে। হাওয়ায় পর্দা দোলে। লরি যায়। যায় মেটাডোর। পেট্রল- ডিজেলের ধোঁয়ার গন্ধ ভাসে বাতাসে। আমি মাটিতে শুইয়া চাহিয়া দেখি পর্দার নীচ দিয়া। কখনো বাতাস নাই। গাছের পাতা কাঁপে না। গুমোট। প্রতিবেশী গোঁসাইদের শাক- সব্জির বাগান ঘিরিয়া থাকা সুপারি গাছগুলির ছায়া ঘরময় ঢুকিয়া পড়ে খোলা জানালা বাহিয়া। কখনো ঝরিয়া পরে সুপারির 'ছই'। বাড়ির পিছনে নটীখাল। তখনো 'বাঁধ'

পড়ে নাই তাহার গতিতে। অলস ছন্দে সে বহিয়া যায় নদীতে। সেই লঙ্গাই নদীতে। শোনা যায় হাঁসেদের কলরব। খালের ধারে, আমাদের বাড়ির পিছনে, রাজাদা'দের বাড়ির বাঁশঝাড়। কখনো বাতাসে ভাসিয়া ছুরির ফলার মতো বাঁশের পাতাগুলি পিছনের দরজা দিয়া ঢোকে ঘরে। সড়সড়্ শব্দ তুলিয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়ায় বৈদ্যুতিক পাখার বাতাসে। ছায়া ক্রমে আসে গাঢ় হইয়া। কোনোদিন আমি পড়ি 'হারানো কাকাতুয়া', কোনোদিন 'অদৃশ্য জলদস্যু', কোনোদিন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদে 'অলিভার টুইস্ট', কোনোদিন হেমেন রায়ের 'ভগবানের চাবুক' নতুবা সত্যজিতের ফেলুদা...

একদিন বাহিরে শোনা যায় এক করুণ আর্তনাদ। এক ছাগশিশুর। আমি বই রাখিয়া বারান্দায় আসি। বাড়ির সামনেই বড়রাস্তা। ঐ পারে পাঠশালা। 'শ্রীভূমি'। তাহার সামনের ছোট মাঠে দিশাহারা চীৎকার তুলিতেছে ঐ ছাগশিশু। কেন চিৎকার করিতেছে সে? সে তো বাঁধা নয়! আশে পাশেও তেমন ভয়ের কিছু নাই! সে নয় আহতও! তবে? কিয়ৎক্ষণ পরে বুঝিলাম তাহার মাতাটি নিকটে নাই। তাই সে ভীত। ক্রন্দনে নিরত। কিন্তু কোথায় তাহার মাতা? আমি বাঁশের গেইট খুলিয়া আসিলাম রাস্তায়। গ্রীষ্মের ধুধু দুপুর । পথেও জনপ্রাণী নাই। কোথায় গেল ছাগমাতাটি? কোনখানে খুঁজিব? খুঁজিব কোনদিকে? কী মনে করিয়া বাম দিকেই আগাইলাম আমি।

বামদিকে, আমাদের বাড়ি ছাড়িয়া রাজাদা'দের বাড়ি। তাহাদের লোহার গেইট। ছাগল ঢোকা সম্ভব নয়। তাহার পরে বাড়ি রামেন্দ্র ভটেদের। উহাদেরও লোহার গেইট। তবে ? তখনই চোখে পড়িল রাস্তার অপর দিকে, 'লন্ডনীবাড়ি'র পাঁচিল ছাড়াইয়া যে গলিটি গিয়াছে তাহাতে একটি আনাগোনার আভাস। আগাইয়া যাইতে যাইতেই শুনিলাম আরেক ক্রন্দন ধ্বনি। ইহা সন্তানহারা ছাগমাতারই বটে। মাতার ডাক শুনিয়া শাবকও ডাকিল, কিন্তু সে দৌড় লাগাইল

সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। আমি দৌড়াইলাম পথ দেখাইতে...কিন্তু আমি নিকটে যাওয়া মাত্র 'মানুষ নিকটে গেলে প্রাকৃত সারস উড়ে যায়'-এর নিয়মে ছাগশিশুটি আরো দ্রুত ছুটিতে লাগিল বিপরীত মুখে ...

'শ্রীভূমি' পাঠশালার খোলা উঠানে দাঁড়াইয়া ভাবিলাম সামান্য। এইবার ছুটিলাম সেই গলির দিকে যেখানে ছাগমাতাটিও ভুল রাস্তায় খুঁজিয়া, সন্ততিকে না পাইয়া বিলাপ করিতেছে সমানে ... আমাকে আসিতে দেখিয়া পলাইল ছাগমাতাটিও তবে সে যেপথে এইবার ছুটিল ঐ পথেই ছুটিতেছে তাহার শাবকটিও...আমি থামিলাম। তারপর ধীরপায়ে অনুসরণ করিলাম ছাগমাতাকে...সামান্য আগাইয়া শাবকটি একবার ফিরিয়া দেখিতেই 'মাতা' তাহার দৃষ্টিগোচর হইল...সে ডাকিল, 'মাতা'ও ডাকিল...সেই ডাকাডাকির ভাষা মনুষ্য ভাষারই মতন স্পষ্টতায় ধরা দিল আমার কানে ...দেখিলাম হারানো শাবককে ফিরিয়া পাইয়া মা দিতেছে তাহার গা চাটিয়া আর শাবকটিও দেরি না করিয়া মত্ত হইয়াছে মাতৃস্তন্যপানে...

এই গ্রীষ্মের আগেও আসিয়াছিল আরও বহু গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের ছুটি ...পরেও আসিল বহু...তারপরে জীবনে এক সময় গ্রীষ্মই রহিল শুধু, গ্রীষ্মের ছুটি আর রহিল না ...তথাপি, অদ্যাপি গ্রীষ্মের কথা ভাবিলেই মনে পড়ে ঐ একটি গ্রীষ্মকাল, ঐ একটি দ্বিপ্রহর...ঐ একটি অদ্ভুত ঘটনা...

১২/০৬/২০১০

আর কে জৈন ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং আমরা...

শীতের মাঝামাঝি। বাতাসে হিম। ঘাসের শরীরে শিশির। জাটিঙ্গার কমলার ঘ্রাণে বাজার ম ম। ফুরিয়ে আসছে ইংরেজি বছর। এমন সময়ে হঠাৎ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বেজে ওঠে গান : 'ও রামা রামা রামা রামা রামা রামা রে ...মেনে মানা মেনে মানা মে হুঁ মাওয়ালী/মাওয়ালী হুঁ মে শয়তান তো নেহি ...গিরা হুয়া কোই ইনসান তো নেহি .../ও রামা রামা রামা রামা রামা রামা রে...' ঝাঁপিয়ে পড়ে বাজনা ...ইস্কুলের ক্লাসঘরে বসে পরীক্ষার খাতায় ভূগোল, ইতিহাস কিংবা বিজ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে মন হারিয়ে যায় ঐ সব অদ্ভুত কথার, উদ্ভট সুরের টানে...ডিসেম্বর মাসে বাৎসরিক পরীক্ষার সেই শেষ বছর। পরের বছর থেকেই বাৎসরিক পরীক্ষার মাস হয়ে গিয়েছিল গ্রীষ্মে। এপ্রিল মাসে।

তখন ক্লাস সিক্স। সাল ১৯৮৩-৮৪। ইস্কুলে চলছে বাৎসরিক পরীক্ষা, আর আমাদের ইস্কুলেরই মস্ত বড় মাঠ ঘিরে দেওয়া হয়েছে ঢেউটিনের ঘেরাটোপে। দিকে দিকে লাউড স্পিকার। খেলা আরম্ভ হলে তাতে চলে ধারা বিবরণী। আর বাকি সময় বাজতে থাকে গান। কখনো "রামা রামা রামা রামা রামা রামা রে", কখনো "ঝ ঝ ঝোপড়ি মে চা চা চারপাই...জীবন মেরা উসি পর হি..." খেলা আরম্ভ হয় বিকাল চারটেতে। টিকিট কাউন্টারের সামনে ভিড় বাড়তে থাকে তিনটে থেকেই। রিক্সাওয়ালা থেকে কলেজশিক্ষক, মায় জজ্-মেজিস্ট্রেট্ সকলেই উপস্থিত ঐ ভিড়ে। সেমি ফাইনাল আর ফাইনালের দিনে ছুটি দেওয়া হয় ইস্কুল কলেজ। ছেলে বুড়ো বাচ্চা এমনকি বাড়ির মহিলারাও এসে হাজির হন সেই খেলা দেখতে। আবালবৃদ্ধবনিতার এই হাজির হওয়ার গহনে যত না ক্রিয়াশীল

ফুটবলপ্রীতি, তার চেয়ে ঢের বেশি উদ্দীপনা উৎসবের। আমোদ সার্কাস দেখার।

শীতের মাঝামাঝি। বাতাসে হিম। ঘাসের শরীরে শিশির। জাটিঙ্গার কমলার ঘ্রাণে বাজার ম ম। ফুরিয়ে আসছে ইংরেজি বছর। নেতাজি মেলা এসে পড়ল বলে ...ঠিক এই সময়েই ইংরেজি নতুন বৎসরের নাকি নেতাজি মেলার আগমনী হয়ে আরম্ভ হয় এই ফুটবল টুর্নামেন্ট। আর কে জৈন স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট। মফস্বলের বুকে যেন এসে হানা দেয় এক ঝলক টাটকা দমকা বাতাস। খেলতে আসে 'এ ডিভিশন' দলগুলি– মিজোরাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মনিপুর থেকে। আসে আসাম পুলিশের দল। আন্তর্জাতিক দল আসে কুশিয়ারা নদী পার হয়ে। বাংলাদেশ থেকে। খেলোয়াড়দের সবার স্থান সংকুলান হয় না মফস্বলি হোটেলে, মোটেলে। ডাক বাংলোতেও ওঠে না কুলিয়ে। ফলে তাঁবু পড়ে খেলার মাঠের পাশে। খেলোয়াড়দের তাঁবু। আমাদের ইস্কুলবাড়ির কোঠাতেও আশ্রয় নেন খেলোয়াড়ের দল। আমরা গিয়ে ভিড় জমাই সেই কোঠাগুলোর আশে পাশে। হাঁ করে দেখি তাদের জুতো, জার্সি, তাদের পৌরুষ। তাদের বীরত্বগাথা ছাপা হয় আঞ্চলিক কাগজে। গতি, সোনার কাছাড়ের কাটতি বেড়ে যায় হুহু করে। আমরা দিন গুনি কবে শেষ হবে এই কালান্তক বাৎসরিক পরীক্ষা ...

পরীক্ষার সময় একেক বেঞ্চিতে বসানো হয় মাত্র দু'জন করে। বেঞ্চির দুই মাথায় দুইজন। তাও আবার দুইজন দুই ক্লাসের। আমি সিক্স। আমার প্রতিবেশী সেভেন। ফলে লাভ হয় না উঁকি ঝুঁকি দিয়েও। পরীক্ষা চলে দুই বেলাই। দশটা থেকে একটা। দুইটা থেকে পাঁচটা। অন্য ইস্কুলের নিয়ম আলাদা। তাদের সকাল মানে ন'টা থেকে বারোটা। বিকাল মানে একটা থেকে চারটা। আমার সব পরীক্ষাই বিকালে। আমার সিট পড়েছে ইস্কুলের যে কোঠাগুলো বড়

রাস্তার দিকে তারই একটাতে। ফলে চারটা বাজতে না বাজতেই দেখতে পাই 'মদনমোহন মাধবচরণ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়'এর বালিকারা নেমে পড়েছে রাস্তায়। ফ্রক পরে শাড়ি পরে যেন চলেছে দলে দলে উড়ন্ত প্রজাপতি। আমি যেপাশে বসেছি বড় রাস্তা তার উল্টোদিকে। তাই ঐ দিকে দেখতে গেলে দেখতে হয় ঘাড় ঘুরিয়ে। আমি ঘাড় ঘোরাই। একবার দুইবার তিনবার মাস্টারমশাই না দেখলেও দেখে ফেলে আমার প্রতিবেশী সেই ক্লাস সেভেনের 'দাদা'। সে ভালো ছেলে। বাঁদিকে সিঁথি কেটে, পরিষ্কার জামা কাপড় পরে আসে পরীক্ষা দিতে। ধীরে সুস্থে লেখে। তারপর 'রিভিশন' দেয় খাতা জমা দেওয়ার আগে ... তার নাম 'সৌমিত্র', তার বাড়ি 'পাগলা পট্টি' আর 'হাসপাতাল রোড' এর 'জাংশনে'। তার পছন্দ হ'ল না আমার এই উঁকি ঝুঁকি। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল : জানালার দিকে তাকিয়ে থাকলে লিখবি কখন? সত্যিই তো! লিখব কখন? আর যে বাকি মাত্র আধঘন্টা সময়! এখনো উত্তর লেখা হয়নি তিনটে বড় প্রশ্নের! আর কে জৈনের মাইকে গান থেমে শুরু হয়েগেছে "রিলে"!!! চেষ্টা নিই প্রশ্নোত্তরে মন দেওয়ার...কিন্তু মন টেনে নেয় 'মদনমোহন মাধবচরণ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়'এর উড়ন্ত প্রজাপতিরা...মন টেনে নেয় আর কে জৈনের রিলে ...উত্তর তিনটে শেষ হওয়ার আগেই বেজে যায় শেষ ঘন্টা। বাড়ি এসে বাবাকে মিথ্যে বলি, মিথ্যে বলি মাস্টারমশাইকে। বলি : সব উত্তর দিয়েছি ... "রিভিশন" দিয়েছি শেষ আধা ঘন্টা... ... মনে মনে ঠিক করি আর নয় পরের পরীক্ষাটা দিতেই হবে ভালো করে... কিন্তু ইস্কুলের কাছাকাছি যাওয়ামাত্র যেই কানে আসে আর কে জৈনের মাইকে গান ...সেই একই রকমের আজব সুরের, অদ্ভুত কথার গান : 'মামামিয়া ...পম্ পম্', 'নয়না মে সপ্না নয়না মে সজনা সজনী কা দিল্ আ গয়া' কিংবা 'বক্ বক্ বক্ মত্ করো নাক তেরা লম্বা ...লাকড়ি কা খম্বা...' অমনি মহম্মদ ঘোরি আর আলাউদ্দিন খিলজি জীবনীর বদলে

চোখে ভেসে ওঠে ‘মদন মোহন মাধবচরণ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়’এর উড়ন্ত প্রজাপতিরা ...চোখ অপেক্ষা করে থাকে কখন পরীক্ষা শেষ ক’রে তারা নামবে রাস্তায়...

পরীক্ষা শেষ হয়। হয়ে যায় আর কে জৈনের ফাইনাল। বাবার সঙ্গে গিয়ে একদিন আমরা দুইভাই দেখে আসি সেই ফাইনাল। আসাম পুলিশ আর মণিপুর রেজিমেন্টের খেলা!! বাঁশের বানানো প্রতিটি টিকিট ঘরের সামনের ভিড়ই উপচে উঠে চলে গেছে হয় বড়ো রাস্তায় নয়তো সিভিল কোর্টের আঙ্গিনা পেরিয়ে। মাঠের পাশেই ছোট্ট টিলা। সেখানেই ডাকবাংলো। টিলার যতোটা সম্ভব টিন দিয়ে ঘেরাও করা হলেও টিলায় ঊঠে পরেছে বিন্‌টিকিটের দর্শকেরা। ভিড় জমেছে সিভিল কোর্টের ছাতেও। শীত দুপুরের রোদের মায়া আলস্যের মতো ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। ভিড়ের আশে পাশে, ভিড়ের খাঁজে খাঁজে খুলে গেছে পানবিড়ির দোকান, এসেছে ‘জাটিঙ্গার কমলা’র ফিরিওয়ালা- ফিরিওয়ালির দল। কমলার ঘ্রাণ ছড়িয়ে পরছে বাতাসে।

সিমেন্টের গ্যালারির পিছনে পাকা রাস্তা। তার ওপারে ‘ট্রেজারি অফিস’। সেই অফিসের বারান্দায় কমলা হাতে আমাদের দু’ভাইকে দাঁড় করিয়ে রেখে বাবা গেল টিকিট করতে। ফিরে এল সিমেন্টের গ্যলারির প্রায় সামনের দিকের তিনটে টিকিট নিয়ে। তখনও মফস্বলে ইস্কুল- কলেজের মাষ্টারমশাইদের এটুকু সম্মান ছিল যে তাদের কে ভিড়ে দাঁড়াতে দেখলে ছাত্র বা প্রাক্তন ছাত্রেরা এসে খোঁজখবর নিত কিংবা বাসে ট্রেইনে ছেড়ে দিতো সিট। বাবারও কোনো প্রাক্তন ছাত্রই বাবাকে যোগাড় করে দিয়েছিল ঐ টিকিট তিনিটি নাহলে ফাইনালের দিনে সিমেন্টের গ্যালারির টিকিট পাওয়া ছিল সর্বৈব অসম্ভব। বাবার নেতৃত্বে, ভিড় ঠেলে আমরা ঢুকতে লাগলাম ভিতরে। মাইকে বাজছে সেইসব আজব সুরের, অদ্ভুত

কথার গানগুলি : 'তাকি তাকি তাকি রে' কিংবা 'সাথ্ মেরে আয়োগি...আইস্‌ক্রিম খায়োগি...'

সিমেন্টের বাঁধানো গ্যালারি মাত্র একটাই। তাই মাঠ ঘিরে বানানো হয়েছে বাঁশের গ্যালারি। রয়েছে দাঁড়িয়ে দেখার ব্যবস্থাও। সিমেন্টের গ্যালারির একপাশে শামিয়ানা টাঙ্গিয়ে 'ভি আই পি লাউঞ্জ'। 'ভি আই পি' বলতে শহরের ডিসি, এসপি, বরফকলের মালিক মনোরঞ্জন বণিক, মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী সমিতির হোমরা চোমরা ক'জন আর কোথাকার দুজন এমপি না এমএলএ । তাদের সামনে রাখা সার সার কাপ- শীল্ড। আজকের খেলার শেষে হবে পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। তারই স্পেশাল ঘোষক হিসাবে শিলচর থেকে আনানো হয়েছে শ্রী ধ্রুব প্রসাদ ভৃঙ্গী মজুমদারকে যিনি শিলচর- করিমগঞ্জ- হাইলাকান্দিতে 'গলাদা' নামে সুবিখ্যাত।

ভিড়ের মধ্যে কোনোক্রমে জায়গা করে বসে পড়া গেল। মাইকের গানও থেমে গেল একসময়। দুই দলের খেলোয়াড়রা এসে দাঁড়াল মাঠের মাঝামাঝি। হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়লো দর্শকদল। আমরাও যতোটা সম্ভব চিৎকার করে নিলাম এই সুযোগে। রেফারির বাঁশিতে আরম্ভ হ'ল খেলা আর তখনই আমার গেল মন খারাপ হয়ে...এই খেলার পরেই আর কে জৈন শেষ! মাইকের গান বন্ধ! শিউরে উঠলাম এইকথা ভেবেও যে পরীক্ষার রেজাল্টও বেরোবে একদিন...অনতিদূরেই...

দুই এক গোলে আসাম পুলিশকে হারিয়ে কাপ নিল মণিপুর রেজিমেন্টে। আলো কমে আসছে বলে পুরষ্কার বিতরণীর জন্য জ্বালানো হলো ফ্লাড্ লাইট। কিন্তু মাথার উপরে হিম পড়ে ঠান্ডা লাগতে পারে বলে বাবা আমাদেরকে নিয়ে ফিরে এল পুরষ্কার বিতরণী শেষ হওয়ার আগেই। রিক্সা পাওয়া গেল না বলে পুরো

রাস্তাই আসতে হ'ল হেঁটে। পাড়ায় ঢুকে মনে হল কী যেন নেই...যেন আরো মিটমিটে হয়ে গেছে বাড়িঘরের ষাট কিংবা আশি পাওয়ারের বাল্‌ব্‌গুলি...

... ...শেষ হয়ে গেল আর কে জৈন। খুলে নেওয়া হ'ল সেই ঢেউ টিনের ঘেরাটোপ, অস্থায়ী টিকিটঘর, তাঁবু...ইস্কুলের কোঠা খালি করে চলে গেলো খেলোয়াড়ের দল... ইস্কুলের পাশের পথে ঘাটে পরে থাকল টিকিটের ছেঁড়া টুকরো...পোস্টার...কিছুদিন...তারপর তাদেরও উড়িয়ে নিয়ে গেল বাতাস... জমাদারের ঝাড়ু...শীত পড়লো জাঁকিয়ে ...শুধু যক্ষীবাবুর পাকাছেলে বাবু বলল চোখ টিপে - 'মাদল ভটের মেয়ে চিত্রা ইন্টারনেশন্যাল হয়ে গেছে...' আমরা মানে জানতে চাইলে সে বলে 'ও গিয়ে শুয়ে এসেছে বাংলাদাশের টিমের প্লেয়ার আনিসুরের সাথে ...' শোনামাত্র টের পাই একরকমের ঈর্ষার আন্দোলন। মাদল ভটের মেয়ে চিত্রা ...আমাদের সহপাঠী লক্ষ্মণের বোন ...আমাদের সবাইকে বাদ দিয়ে সে কিনা...তবু মনে মনে উৎসাহে বুক বেঁধে আমরা অপেক্ষা করে রইলাম পরের বছরের আর কে জৈন আর বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য...

২২/০৮/২০১০, বেঙ্গালোর

‘নাইয়ারে নাওএর বাদাম তুইল্লা’

সুকুমার রায় লিখেছিলেনঃ

ট্যাঁশ্ গরু গরু নয় আসলেতে পাখি সে;
যার খুশি দেখে এস হারুদের আফিসে।

আর প্রায় পাঁচ বছর ধরে ফ্ল্যাট বাড়িতে বাস করতে করতে, পরিচিতদের ফ্ল্যাট বাড়িতে যেতে যেতে, আসতে আসতে আমার মনে হচ্ছেঃ

ফ্ল্যাটবাড়ি বাড়ি নয় আসলেতে ফাঁকি সে

ওয়েটিং রুমে ঘুম, উঠে যাওয়া আপিসে ..

সারাদিনের অফিসের বিরক্তি আর ক্লান্তি নিয়ে ঢোকামাত্র আজ মনটা আনন্দে ভরে গিয়েছিল কারন কারেন্ট চলে গিয়েছিল কোঠায় পা রাখা মাত্র ... আকাশে সুগোল চাঁদ, আবছা কুয়াশা ... অন্ধকার ঘরে রহস্যের আবছায়া ... আহ্, এক মুহূর্তে ফিরে আসতে চাইছিল 'ছেলেবেলার গল্প শোনার দিনগুলি ...'

অমনি জ্বলে উঠল বিজলিবাতিগুলি। মুছে গেল গগন ঠাকুরের ছবির মতো সেই অন্ধকার ... মুছে গেল ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে তবু তা জড়িয়ে রইল এই ফ্ল্যাটের মুখোমুখি 'গরিব গুর্বো'দের ভিটেগুলোকে ... অর্থাৎ জেনারেটার চলল ফ্ল্যাটে ... বাবু- বিবিরা নিশ্চিন্দি হলেন। এলসিডি পর্দায় ঝিকিয়ে উঠলেন ওবামা হোম থিয়েটারে 'কলা-বারি' গেয়ে উঠলেন রজনীকান্তের জামাতা ... বৈদ্যুতিক লোম তোলা মেশিন চলতে লাগল বিবিদের বগলে বগলে ... কার্টুন নেটওয়ার্কে শোনা গেল শিন্‌চেন্'এর একঘেয়ে কন্ঠস্বর ... একদল বাচ্চা ডুব দিল তাতে আর আরেক দলকে গিলে খেল 'হোমটাস্ক' ... বাবুরা আয়েসে চুমুক দিলেন বিয়ারের, হুইস্কির গেলাসে ... হায়, হারিয়ে গেল রহস্য, শৈশব, চাঁদ, জ্যোৎস্না ... আমার মনে পড়ল ডেভিড ফিন্‌চারের 'ফাইট ক্লাব' ছবির নায়ককে যে অবচেতনে এমনই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল এই ফ্ল্যাটকেন্দ্রিক জীবনে যে একদিন, নিজের অজান্তেই তার 'অল্টার ইগো' নিয়ে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল ঐ জন-জঙ্গল, তারপর থাকতে চলে গিয়েছিল শহরের প্রান্তে এক পোড়ো বাড়িতে ...

মনে পড়ে বালকবেলার কথা ...কারেন্ট চলে যাওয়া মানেই ছুটি। পড়াশোনা নেই। মা বা বাবা হ্যারিকেন, মোমবাতি জোগাড় করে জ্বালিয়ে দিলেও পড়ানোর উদ্দীপনা যেন কমে যেত ওদেরও। কখনো জ্যোৎস্নায় ভেসে যেত ঘর, বারান্দা ... কখনো বাদলার বাতাস এসে উড়িয়ে নিত দরজার, জানালার পর্দা ... কখনো,

পেছনের বারান্দায় গিয়ে বসতাম খালের পাড়ে ... কখনো সামনের বারান্দায় বসে অপেক্ষা করতাম কখন ঝন্‌ঝনাৎ শব্দ তুলতে তুলতে চলে যাবে একটা দুটো রিক্সা, সাইকেল ...

বয়ঃসন্ধির থেকে কৈশোরের দিকে যেতে যেতে ঐ কারেন্ট চলে যাওয়া আত্মপ্রকাশ করল আরেক অবয়বে ... ব্যাটারিচালিত রেডিওর নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গান শোনা ... মনে পড়ে ঐ ভাবে, নব্ ঘোরাতে ঘোরাতেই একদিন শুনেছিলাম, অশোকতরুর কন্ঠে : 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে ... কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে এমন গানে গানে ... কেন তারার মালা গাঁথা, কেন ফুলের শয়ন পাতা... কেন দখিন হাওয়া গোপন কথা জানায় কানে কানে ...'। কতদিন এমন হয়েছে যে কারেন্ট নেই এই অছিলায় ফিরিয়ে দিয়েছি মাস্টার মশাইকে ... কোনো কোনো দিন ঐ অছিলায় মাস্টার মশাই নিজেই চলে গেছেন ...আর কারেন্ট না থাকার রাত্রিটি ডাল পালা মেলে ছড়িয়ে যেতে যেতে পার হয়ে গেছে ঘড়িতে ধরা বাঁধা সময়ের চক্রবাল ...

একদিন, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের দিকে, নামল বৃষ্টি, ছুটল বাতাস ... যথারীতি চলে গেল কারেন্ট ... বৃষ্টি হল সারারাত ... টিনের চালে ঝরে গেল বৃষ্টি, উড়ে আসা পাতা, ডালপালা ... ভরে উঠল নদী, খাল, বিল ... সন্ধ্যায় ঘন্টা খানেকের জন্য কারেন্ট এসেই আবার নেই ... বৃষ্টির যমজ যে-আলস্য সেই আলস্যে সারাদিন যাইনি কোথাও ... তখন ইস্কুলের শেষ দিক ... যাওয়া মানে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যাওয়া মফস্বল শহরের কেন্দ্রে, মফস্বলি পার্কে ...

সন্ধ্যা ক্রমে রাত্রি হয়ে গেল। আবার বাতাস বইল। আবার বৃষ্টি নামল। তবু আমার বিছানার মাথার দিকের জানালাটা বন্ধ করলাম না ... জানালার বাইরে গোঁসাইদের বাগানের বড় বড়

আশ্‌শ্যাওড়ার গাছ ... তার অন্ধকার পাতার আড়ালে অন্ধকার আকাশ ... দূরের বাতাসে সেই আশ্‌শ্যাওড়ার ডালপালা সরে যাচ্ছে, বেরিয়ে পড়ছে আরেক টুকরো আকাশের অন্ধকার ... আমাদের বাড়ির পেছনের খালও জলে ভরে গিয়ে ছুঁয়ে দিয়েছে উঠোন, পেছনের বারান্দার সিঁড়ি ... সিঁড়িতে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিচ্ছে ঢেউ ... হায়, আমার সন্ততিরা বঞ্চিত মর্মের ঐ সব অলৌকিক অভিযান থেকে ... এরা ফ্ল্যাটে বেড়ে উঠছে ... হায়, ফ্ল্যাটে বেড়ে উঠে মানুষ হওয়া যায় কি প্রকৃত? যেমন মানুষ অপু, দুর্গা, জাঁ ক্রিস্তফ্‌, প্রিন্স্‌ মিশ্‌কিন বা নিতান্ত 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র শশী ডাক্তার? ... জানিনা। জানতে চাই না। আমি ভুলে যেতে চাই, ভুলে থাকতে চাই আমার এই ফ্ল্যাটজীবন, এই আইটি বাস্তবতা ... আমি টের পাই আমি হেরে গেছি, টের পাই আমি চাই বা না চাই আমার যাপন হয়ে গেছে নাগরিক ... আমার দুঃখুগুলো, সত্যজিত রায়ের 'অরণ্যের দিন রাত্রি'র সৌমিত্র চাটুজ্জের দুঃখু ... সাঁওতাল পরগণার পরিবর্তে অফিসের পাট্টিতে নাহয় উইক্‌-এন্ড টিরিপে গোয়ায় গিয়ে নয়তো কোনো রিসর্ট-এ গিয়ে মাল খেয়ে উথলে ওঠে ... আর তখন ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে থাকি ' হইতে ছিলাম গারিবলডি ... হইয়া গেলাম আইটি প্রো ...' ... আর ঐ সময় আমার মুখটা যে ঠিক, টলস্টয়ের 'ইম্প এন্ড দ্য পীসেন্ট্‌স্‌' ব্র্যাডের সেই হঠাৎ টাকা হওয়া মাতাল চাষীটির মতোই হয়ে ওঠে সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ আর নেই ...

আমি মরে গেছি। সন্দেহ নেই। আমার সন্তানদের আমি ছিন্নমূল করেছি। তাদের কোনো জন্মভূমি, জন্মস্থান নেই ...জানি ... তথাপি মাঝে মাঝে মনে পড়ে সেই কারেন্ট না থাকা রাত্রি, সেই আষাঢ়ের, শ্রাবণের ... আমাদের বাড়ির পেছনের খাল জলে ভরে গিয়ে ছুঁয়ে দিয়েছে উঠোন, পেছনের বারান্দার সিঁড়ি ... সিঁড়িতে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিচ্ছে ঢেউ ... আর ঐ বিষ্টি- বাদ্‌লার রাত্রে ছোট্ট

খেয়ানৌকা দিয়ে কারা যেন চলেছে কোথায় ... তারা গান গাইছে ‘নাইয়ারে নাওএর বাদাম তুইল্লা কুন্ দেশে যাও চইল্লা ...’ মনে পড়ে সেই তারাপদকে, যে এমনই নৌকার থেকে ভেসে আসা গানের টানে পেছনে ফেলে সমস্ত সুখের হাতছানি, ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জলে, সাঁতরে গিয়ে উঠেছিল ঐ নৌকায় ...

আমি মরে গেছি। সন্দেহ নেই। আমার সন্তানদের আমি ছিন্নমূল করেছি। তাদের কোনো জন্মভূমি, জন্মস্থান নেই ...জানি ... তথাপি দেবতা, হে আমার নিজস্ব দেবতা, তোমার কাছে কি নেই তেমন সঙ্গীত যার স্পর্শে মৃতও প্রাণ পেতে পারে ... সাঁতরে পার হয়ে যেতে পারে এই ফলাট- জীবন, এই আইটি যাপন? ... দেবতা, হে আমার নিজস্ব দেবতা, সেই বাদলের রাত্রে আমার ঝাঁপানো হয়নি জলে, আমাকে ক্ষমা করো ... আমাকে ক্ষমা করো আর ... আর যেহেতু তুমি দেবতা, তাই সব ভুলে আরেক বার, আর শুধু একবার গেয়ে ওঠো সেই গানটি ‘নাইয়ারে নাওএর বাদাম তুইল্লা কুন্ দেশে যাও চইল্লা ...’ ... এবারও যদি সাড়া না দিতে পারি তোমার ডাকে, তাহলে সত্যই আমাকে মৃত বলে ঘোষণা করে তুমিও না হয় ফেলে চলে যেও ... কিন্তু তার আগে নয় ...

দেবতা হে, হে আমার নিজস্ব দেবতা, আমাকে আর একবার সুযোগ দাও ...

১২/১২/২০১১